ISSN:3139-1192(Online)

SCINTIA

Online Peer-reviewed Multidisciplinary Journal

December 2024
Volume- 2

Netaji Satabarshiki Mahavidyalaya, Ashoknagar,
North 24 Parganas, West Bengal- 743223

Contents lists available at https://scintia.in/

SCINTIA
Online Peer-reviewed Multidisciplinary Journal
ISSN: 3139-1192 (Online)
[Published by Netaji Satabarshiki Mahavidyalaya]

মধ্যবিত্ত জীবনের ট্র্যাজেডিতে “বারো ঘণ্টা”

বিদিশা মাহাতো

সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, অশোকনগর, পশ্চিমবঙ্গ

সার সংক্ষেপঃ

১৯৪৭ সাল, অখণ্ড ভারতবর্ষ দ্বিধা বিভক্ত। এই বিভেদ মানুষের জীবন ক্ষতবিক্ষত করেছিল। কত মানুষকে গৃহহারা হয়ে উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল। স্বাভাবিক জীবন-যাপন বিধ্বস্ত হয়েছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক- সকল দিক থেকে এক কঠিন লড়াই এর সম্মুখীন তখন সমাজ। রাজনীতির এই বীভৎসতা সমাজ থেকে পরিবার, পরিবার থেকে ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত বিপর্যস্ত করল। একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভাঙতে শুরু করলো। ঠিক এমন সময় দেশভাগের ফলাফলের করুণ হৃদয়বিদারক ছবি সমাজের সামনে দায়িত্ব সহকারে তুলে ধরে মানুষকে সচেতন করার কাজ শুরু করেছিল বাংলা নাট্যসাহিত্য তথা নাট্যাভিনয়। আমার আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয় নাট্যকার কিরণ মৈত্রের “বারো ঘণ্টা” নাটকটি। নাটকটির প্রকাশকাল ১৯৫৮। দেশভাগের ফল যে সুদূরপ্রসারী, তার ফলে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে যে কুপ্রভাব বা ছাপ পড়েছিল তা অত্যন্ত ট্র্যাজিক ভাবে নাট্যকার আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। গোটা মধ্যবিত্ত

To cite this article: Mahato, B. (2024). মধ্যবিত্ত জীবনের ট্র্যাজেডিতে “বারো ঘণ্টা”. *Scintia*, 2, 115-131.

সমাজ জীবনের নগ্ন রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন নাটকটির মাধ্যমে। নাটকের সংলাপ বারংবার আমাদের এক চরম সত্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়, "মানুষগুলো মরছে আর কাঁদছে। কাঁদছে আর মরছে"। এই পরিস্থিতির কি কোন পরিবর্তন এই একবিংশ শতকে আদৌ হয়েছে! যদিও এই শতকের মানুষগুলি আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে কতটা মরছে তার উত্তর সময়সাপেক্ষ। তবে আপাতত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষগুলি আত্মিক-বাহ্যিক-নৈতিক দিক থেকে মরছে যার সুদূরপ্রসারী বাস্তবতা ভবিষ্যৎ সাহিত্যে নিশ্চয় প্রতিফলিত হবে। বর্তমানে আলোচ্য "বারো ঘণ্টা" নাটকটির জনপ্রিয়তার কথা যদি ভাবি তাহলে খুব সহজেই অনুমান করা যায়, নাটকটির তৎকালীন চরম বাস্তবতা নাটকটিকে এক আলাদা পর্যায়ে উন্নীত করেছিল, যার আনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধে বলার চেষ্টা করবো।

সূচক শব্দঃ মধ্যবিত্ত জীবন, অভাব-অনটন, মানবিকতা, অসহায়তা, দেশভাগ, বারো ঘণ্টা ।

Correspondent author E-mail address: bidishamahato1990@gmail.com.

নাট্যকারের যে নাটকটি আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু সেটি হলো "বারো ঘণ্টা"। নাটকটির মধ্যে সময় একটি বিশেষ চরিত্র রূপে ধরা দিয়েছে। মাত্র বারো ঘণ্টার মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ট্র্যাজিক পরিণতি নাটকটির মুখ্য বিষয়। এই সম্পর্কে লেখক নিজে মুখবন্ধ অংশে যা বলেছেন তা লিপিবদ্ধ করলাম-

"লিখতে বসে আমার মনে হয়েছিল, যা লিখবো তা যেন বাস্তবিক হয়। অর্থাৎ তাদের কথা আমি বলব যাদের আমি একজন। তাই মধ্যবিত্ত জীবন বর্তমান নাটকের উপজীব্য হয়েছে।

যেটুকু কল্পনার রঙ না চড়ালে নাটক হয় না ততটুকুই রঙ চড়িয়ে মধ্যবিত্ত মানুষদের হাজির করেছি” (মৈত্র শ্রী কিরণ, পৃষ্ঠা -৬)।

সুতরাং লেখকের বক্তব্য থেকেই উঠে আসে নাটক সৃষ্টির পটভূমি- একটি একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবারের ছবি। পরিবারের সবচেয়ে বয়স্য ব্যক্তি হলেন রাজেশ্বর বাবু, বয়স প্রায় ৬০-এর কাছাকাছি, তিনি আবার মানসিক রোগগ্রস্ত। যার প্রমাণ পাচ্ছি নাটকের শুরুতেই পোস্টারম্যানকে চোর ভেবে চিৎকারের মধ্য দিয়ে। রাজেশ্বর বাবুরা যে বাড়িতে ভাড়া থাকেন, সেই বাড়ির ছাদে মই লাগিয়ে এই পোস্টারম্যান পোস্টার আটকাতে উঠছিল। থিয়েটারের পোস্টার। থিয়েটার যা কিনা মানুষের দুর্দশার আসল রূপটা সমাজের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে। যেন মানুষ আয়নায় নিজের ক্ষতবিক্ষত চেহারাটা দেখতে পায়। তাই বোধ হয় লেখক নাটকের শুরুতেই থিয়েটারের প্রসঙ্গ এনেছেন। যার দ্বারা সমাজের ঠক-গুন্ডা-জোচ্চর শাসকদের বিরুদ্ধে কিছু বলা যায়, লড়াইয়ের ভাষা পাওয়া যায়। কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত সেখানেই হলো যেখানে মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলার প্রথম ধাপ হিসেবে এগিয়ে যাওয়া যায়। তাই থিয়েটারের প্রসঙ্গ নাট্যকার খুব ভেবেচিন্তেই অবতারণা করেছেন বলে আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয়। থিয়েটারকে করে তুলতে চেয়েছেন সমাজের ভালো মন্দ দিকগুলি তুলে ধরার বার্তাবাহক হিসাবে। যা আমরা নাটকের মধ্যে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারবো।

একটা পরিবারের চরম বাস্তব অসহায় পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে পাঠক ও দর্শক। নিজেদের জীবন-সমস্যা যেন চোখের সামনে দেখতে হয়। অমিয়র স্ত্রী রাধার হার্ট প্রবলেম, অ্যানিমিয়া, ছয় মাস ধরে সে বিছানায় শয্যাশায়ী। শরীরের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ রোগের করাল ছায়া গ্রাস করে আছে রাজেশ্বর বাবুর পরিবারকে। এর পাশাপাশি সন্ধ্যাও অবিবাহিত, তাঁর দাদা তাঁর বিয়ের জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেনি কিন্তু মেয়ের বাপ দাদাদের

পয়সা না থাকলে কে বিয়ে করবে মেয়েকে! কন্যাদায়গ্রস্ত গরিব বাবা-দাদাদের অবস্থা বরাবরই শোচনীয়। তারই নগন্য রূপ নাটকে প্রস্ফুটিত। যেখানে একজনের রোজগারের ওপরে আটজন মানুষের কোনরকমে খাওয়া পরা চলে, সেখানে ডাক্তার দেখানো, বোনের বিয়ে দেওয়া, ছেলের নতুন জামা কাপড় কেনা- সবই ব্যয় বাহুল্য একজনের পক্ষে। অর্থাৎ পাশাপাশি দেশের বেকারত্বের সমস্যাও লেখক স্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন। তখন মানুষ ভেবে কুল করতে পারছে না যে কী করলে তারা দুবেলা দুমুঠো খেয়ে পরে বাঁচবে অন্তত ভাত কাপড়ের অভাব ঘুচবে। দেশে চাকরি নেই অথচ জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে। তার ওপর দিয়ে চলতে থাকে মানুষরূপী পশুর বিশ্বাসঘাতকতার খেলা। এই সবকিছু মিলিয়ে দরিদ্র মানুষগুলি ভীষণ অসহায়। তাই তো নিখিল টিউশনি করতে চায়, সন্ধ্যা চাকরি করতে চায়। নিখিলের দাদা ভীষণই আশান্বিত যে, নিখিল বি.এ পাশ করে যাবে আর শুধু পাশ নয়, ডিস্টিংশনে পাশ করবে। তাই নিখিল টিউশনি করতে চাইলে স্বপ্নপ্রিয় দাদা অমিয় তাঁর ভাইয়ের প্রতি মমত্ব বোধ থেকে বলে ওঠে যে, ‘ওসব টিউশনি-ফিউশনি করতে হবে না এগজামিনের সময় দিন নেই, রাত নেই পড়েছিস, এখন একটু বিশ্রাম কর।’ একটা পরিবারের যে ছবি আমরা আপাতত দেখলাম তাতে স্নেহ আছে, বিশ্বাস আছে, অভাব আছে, বেকারত্বের সমস্যা আছে, শারীরিক-মানসিক রোগের গভীর আঘাত আছে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে তৎকালীন সময়ের অনেকগুলি সমস্যা লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

তবে নাটকটি পড়তে পড়তে বারবার যেটা মনে হয়েছে, এত সমালোচিত একটি নাটকের একবিংশ শতকে এসে গ্রহণযোগ্যতা কোথায় সেটিকে খুঁজে বের করা। তারই চেষ্টা করে গেছি নাটকের চরিত্রগুলির বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। নাটকের চরিত্র এবং সংলাপ সর্বকালের, কারণ যতদিন মনুষ্যসমাজ আর্থিক, সামাজিক দিক থেকে সাম্যের পথে না হাঁটবে ততদিন দরিদ্রতা

আমাদের গ্রাস করতে থাকবে। তাই মানসিক মানবিক উত্তরণের পথ আমাদের খুঁজে পেতে হবে এই সকল ভবিষ্যৎদ্রষ্টা সাহিত্যগুলি থেকে, যা আমাদের ভবিষ্যৎ চলার পথের পাথেয় হবে। প্রথমে অমিয় সম্পর্কে একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করছি। কারণ রাজেশ্বরবাবুর পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য তাঁর বড়ো ছেলে অমিয়।

অমিয় বাজার থেকে ফেরে বহুদিন পর সাক্ষাৎ হওয়া ছোটবেলার বন্ধু সমরকে নিয়ে। বাড়ি ঢুকতেই তারা শুনতে পায় রাজেশ্বর বাবুর প্রলাপ- "পালাল .... পালাল .... চুরি করে পালাল"। অমিয় এই সম্পর্কে অবগত হলেও, সমরের কাছে কৌতূহল উদ্রেক করার মতো ঘটনা। তাই সমরের কৌতূহল দূরীভূত করার প্রসঙ্গে জানতে পারি যে, অমিয়র বাবা রাজেশ্বর বাবুর অফিসের কোন এক ঘটনায় চাকরি চলে যায়, তারপর থেকেই তিনি মানসিক রোগগ্রস্ত। অমিয়র মা জামা সেলাই করে, ঠোঙা তৈরি করে অমিয়দের মানুষ করে। অমিয় যখন ম্যাট্রিক পাশ করে তখন অমিয়র মা হঠাৎ মারা গেলেন। তাই অগত্যা সংসারের হাল ধরার জন্য অমিয়কেই সামান্য কেরানির চাকরি জোগাড় করতে হয়। অমিয়র দেড়শো টাকা মাইনের চাকরিতে চল্লিশ টাকা চলে যায় বাড়ি ভাড়া গুনতে, বাকি যা পড়ে থাকে তা দিয়ে কোন রকমে সংসার চলে যায়- অসুস্থ বৌকে একটা ভালো ডাক্তার দেখাতে হবে তারও উপায় নেই। এইভাবেই চলছে অমিয়র সংসার। অমিয় বোন সন্ধ্যাকে সমরের জন্য চা আনতে বলে। সন্ধ্যাও কিছুক্ষণের জন্য সমরকে একা পেয়ে একটা চাকরি খুঁজে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু এ কথা অমিয় জানতে পেরে আপত্তি করে আর বলে যে, -

"অমিয়ঃ সন্ধ্যাকে আমি চাকরি করতে দিতে রাজি নই সমর। আমি থাকতে, অনিল নিখিল থাকতে, সন্ধ্যা চাকরি করবে এটা আমি চাই না" (মৈত্র শ্রী কিরণ, পৃষ্ঠা -৮)।

কারণ যে পরিবারে তিনটে ভাই আছে সেই পরিবারের মেয়ে চাকরি করতে যাবে কেন! তার

থেকে বরং সন্ধ্যার জন্য বিনা পণে রাজি এমন একটা পাত্র খুঁজে দিলে সে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবে। এখানে লেখক অমিয়ের দুইরকম মানসিকতার দিক আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। প্রথমত, দাদা হিসেবে তাঁর অপত্য স্নেহ সন্ধ্যার প্রতি। দ্বিতীয়ত, এমন একটা মধ্যযুগীয় ধারণা যে চাকরি করতে যাওয়া মেয়েদের সম্মানহীনতার চোখে দেখা। তৎকালীন সমাজ মেয়েদের সামাজিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত বা আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণের বিপরীতেই ছিল। তাই একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের সম্মানের সাথে শ্বশুর বাড়িতে সংসার করার মধ্যেই বর্তে যাওয়ার গল্প লুকিয়ে থাকে। এই পিছিয়ে পড়া ধ্যান ধারণার বশবর্তী গোটা সমাজ। অমিয়ের সন্ধ্যাকে চাকরি করতে দেওয়ার থেকে বিয়ে দিয়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। তার ওপর আবার বিনা পণে পাত্র খুঁজে দেওয়ার দাবী। এইরকম সময়ে বিনা পণে পাত্রী উদ্ধার কর্মে নিয়োজিত হৃদয়বান, নীতিবান পরিবারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়াও মুশকিল। গোটা নাটক জুড়ে একজন কর্তব্য-পরায়ণ, স্নেহশীল অভিভাবককে আমরা পাই।

নাটকে অমিয়র আর এক ভাই যে অনিল। অত্যন্ত ঠোঁটকাটা বকাটে ছেলে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। সে নিজের পরিচয় দেয় দাদার পরের ভাই বলে আর জানায় তাঁর পেশা বেকারী। সমরের বেকার কেন প্রশ্নের উত্তরে অনায়াসেই জানায়- 'চাকরি পাওয়া যায় না বলে।' চেষ্টা করেও কোন রকম কোন সুরাহা সে করতে পারেনি তাও জানায়। আমরা আরও অবাক হই কোন রকম দ্বিধা ছাড়াই অমিয়র বন্ধু সমরের কাছ থেকে অনিল একটা টাকা ধার চেয়ে বসে। কারণ সিনেমা দেখবে। মেট্রোয় রিটা-র একটা বই এসেছে যেটা নাকি খুব হিট পিকচার হয়েছে। সমরের কাছ থেকে ধার পেয়ে সে সমরকে একথাও জানাতে ভোলে নি যে, "আমি যে ছেলেটা ভালো নই এ কথাটা বড়দাকে বলবেন না। বড়দা মনে দুঃখ পেতে পারে"। অবশ্য অনিলের বড়দাও জানে অনিল খুব ভালো ছেলে নয়। এরপরের অনিলের কথা আরও চমকপ্রদ

কারণ সে হঠাৎ সমরকে বলে যে, সে তাঁর বোন সন্ধ্যাকে বিয়ে করতে পারবে কিনা? উত্তরে সমর অনিলকে জানায় যে, দাদারা সন্ধ্যার বিয়ের জন্য খুব ব্যস্ত। অনিলও হয়তো খুব চিন্তিত সন্ধ্যার বিয়ের জন্য। সপাটে গালে চড় পড়ার মতো উত্তর- "না। আমি তা হই নি। কারণ আমি জানি সন্ধ্যার বিয়ে হবে না। আপনার ওপর একটা চান্স নিলাম"। এইটুকু ঘটনার মধ্যে দিয়ে একজন বেকার ভাইয়ের অসহায়তা খুব নির্লজ্জ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নাটকের মধ্যে। পাঠকের মনে হতে পারে একজন বেকার ছেলে সিনেমা দেখার লোভ সামলাতে পারলো না! আসলে অনিল সমরকে হয়তো পরীক্ষা করে দেখছিল। তবে যাই হোক না কেন বেকারত্বের সমস্যা আজও আমাদের দেশে বিদ্যমান। এর বিরুদ্ধে কে কি করতে পেরেছে আজ পর্যন্ত! বেকারত্বের জ্বালায় কত তরুন প্রাণ কখনো মৃত্যুকে বেছে নিয়েছে, কখনো বা চুরি ডাকাতির পথ বেছে নিয়েছে, কখনো বা জোর জুলুমের ওপর নির্ভর করে হিংসাত্মক পথ বেছে নিয়েছে। বেকার থাকার জ্বালা নিয়ে বাঁচতে বাঁচতে মানুষ হতাশার শেষ সীমায় পোঁছে গিয়েছে। সুস্থ স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তাই অনিল গোটা বেকার সমাজের প্রতিনিধি হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বেকার বলে কি জীবনের শখ আহ্লাদ সব ত্যাগ করে দিতে হবে? ভালো হওয়ার মুখোশ এঁটে বসে থাকতে হবে? অনিল স্পষ্ট বক্তা, অপ্রিয় সত্য কথা বলতে সে পটু তবে সে দায়িত্ব জ্ঞানহীন নয়, সে নিরুপায় এবং অসহায় তবে বাস্তবকে মেনে নিতে সে কুণ্ঠা বোধ করে না। সমাজের লোক দেখানো বিষয়গুলি খুব সহজেই তাঁর জবানীতে উঠে আসে কিন্তু অনিলের এই বকাটে চরিত্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা নরম মন যা থেকে বোঝা যায়, এই পরিবারের জন্য সে চিন্তিত। যেটা সে কাউকে বুঝতে দেয় না। তাই তো বৌদি এবং বোনের শারীরিক অবনতির কথা ভেবে কমলালেবু কিনে আনে। ভাইপো মানিকের অসুস্থ মা সেরে উঠছে না কেন এই প্রশ্নেরও সোজাসাপটা উত্তর দিয়েছে অনিল,- ভালো ডাক্তার দেখানো হয় না বলে মানিকের মা সুস্থ হচ্ছেন না। কিন্তু কেন ভালো ডাক্তার দেখানো হয় না তারও স্পষ্ট উত্তর দেয় অনিল, "আমরা

গরীব বলে"। "আমরা কেন গরীব?" – এর কোন উত্তর অনিল দেয় না। শুধু পড়াশোনায় গাফিলতি হচ্ছে বলে মানিককে বকা দেয়। আসলে কেউ কেন গরীব – এই কথার কি বা উত্তর দেবে অনিল! এর উত্তর বোঝার মতো বয়স মানিকের হয় নি। এই সমস্যা তো শুধু উপলব্ধি করা যায়, এর থেকে বেরনোর কি কোন উপায় জানা আছে কারোর! জানা থাকলেও তার প্রয়োগ হয়তো কখনো হবে না কারণ তাহলে ক্ষমতায় আসীন লোভী স্বার্থান্বেষী শাসকদলের গরীব অসহায় মানুষগুলির ওপর কর্তৃত্ব ফলানো যাবে না। অসহায়তার, কুশিক্ষার চরম সীমায় পোঁছে দিয়ে তাঁদেরকে নিজেদের গদি বাঁচানোর কাজে লাগানো যাবে না। হায় রে মানব সভ্যতা!

এরপর মঞ্চে যখন দ্বারিকবাবুর প্রবেশ ঘটে তখনও দ্বারিকবাবুর সাথে অনিলের কথোপকথন থেকেও আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, অনিল কখনই সমস্যা ছেড়ে পালিয়ে যায়নি বরং তাঁর স্পষ্ট কথার কাছে সব মুখোশ পরা চেহারাগুলি যেন উন্মুক্ত হয়ে গেছে। দ্বারিকবাবুর মেয়ে মায়া এবং ছেলে অলোক। মায়ার অসুস্থতার জন্য অনেক ধার দেনা হয়ে গেছে তাই অমিয়র কাছে এসেছে যদি দেনাটা মেটানো যায় এই আশায়। অমিয়র অনুপস্থিতিতে অনিলের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি ভাড়ার টাকা চাইতে এসেছেন। কথায় কথায় দ্বারিকবাবু জানায় তাঁর মেয়ের অসুস্থতার কারণে তাঁর অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে তার ফলে তিনি ভালোরকম দেনার দায়ে পড়ে গেছেন। নিজে থেকেই অনিল দ্বারিকবাবুর মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গ তোলে। উপরন্তু সামনাসামনি দ্বারিকবাবুর মেয়ে মায়াকে বিয়ে করবে বলে জানায়, তবে পণ টন লাগবে না। শুধুমাত্র যত টাকা বাড়ি ভাড়া বাকি আছে তা ছেড়ে দিতে হবে আর যতদিন না অনিল রোজগার করবে ততদিন পর্যন্ত বাড়ি ভাড়া চাইতে পারবে না। এইকথা শোনার পর থেকেই দ্বারিকবাবুর চলি চলি ভাব। তবে যাওয়ার আগে তিনি বলতে ভোলেন না যে অনিল বেকার তাই অনিলের হাতে কন্যা সমর্পণ করতে রাজি নন। তারপর আবার বাড়িতে বড়ো বোন

সন্ধ্যারও বিয়ের ব্যবস্থা হয় নি। কথা প্রসঙ্গে অনিলও জানায়, সন্ধ্যার ব্যাপারে না ভেবে বরং আপাতত তাঁর মেয়ের সাথে বিয়েটা দিয়ে দিক। যতদিন না অনিল রোজকার করছে ততদিন না হয় মায়া দ্বারিকবাবুর বাড়িতেই থাকবেন। এইখানে দ্বারিকবাবুর যে বক্তব্য তা উল্লেখ করা অতি প্রয়োজনীয়। কারণ দ্বারিকবাবুর মতে,-

"দ্বারিক বাবুঃ আজকের দিনে মেয়ের বিয়ে দেওয়া মানে ঘাড়ের বোঝা নামানো। তা বিয়ে দিয়ে যদি ঘাড়ের বোঝা ঘাড়েই থেকে যায় তা হলে বিয়ে দেবার দরকারটা কি বল?" (মৈত্র শ্রী কিরণ, পৃষ্ঠা -১৯)

মেয়েদের বোঝা ভাবা মধ্যবিত্ত সমাজের একটা প্রচলিত ধারণা। এই মানসিকতা থেকে উত্তরণের জন্য যে আত্মসচেতনতা প্রয়োজন, তার বড়ই অভাব আমাদের দেশে। তাই তো আজও কত শত মেয়ের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্নভঙ্গ হতে দেখি, দুধের শিশুকে নিয়ে আত্মহত্যার খবর শুনি অথবা শ্বশুর বাড়িতে অত্যাচারিত হয়ে জীবন বিপন্ন হতে দেখি। তার কারণ একটাই- মেয়েদের বোঝা ভাবাটা বন্ধ করতে হবে। নারী পুরুষ উভয়েই নিজেদের অস্তিত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে নিষ্ঠাবান হওয়াটা অত্যন্ত প্রয়োজন, মানবিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এরপর আবার অনিলের সামনে দুধওয়ালা এসে উপস্থিত। সেও তাঁর পাওনা টাকা দাবী করে। এমতাবস্থায় সে জানতে পারে বৌদির জন্য দুধ নেওয়া বন্ধ হয়েছে কারণ দুধওয়ালার পঁচিশ টাকা পাওনা আছে- এই কথা জানতে পেরে অনিল তাঁর ফুটবল খেলায় পাওয়া সোনার মেডেলটা গোয়ালাকে দিয়ে দেয় এবং রোজ বাড়িতে দুধ দিয়ে যাওয়ার কথা বলেও দেয়। সন্ধ্যার কথা প্রসঙ্গেই জানা যায়, মেডেলটা রোজ একবার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে না দেখলে তাঁর ঘুম আসতো না, সেই মেডেলটা নিজের থেকে দূরে সরিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করলো না অনিল। উল্টে সে সন্ধ্যাকে বলে গেল- "বেকারদের অত ঘুম ভালো নয়"।

তবে মায়ার সাথে কথোপকথনের সময় অনিলের চরিত্র আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনিল মায়ার কাছ থেকে গান শুনতে চায়। “ভেবেছিলাম বাঁধবো আমার বীণা/পথিক যবে আসবে আমার দ্বারে”। গানটিতে ভালবাসার আবেগ, ভালো থাকার আশার আলো ছড়িয়ে আছে, পাশাপাশি হতাশার হাতছানির ছবিও পরিস্ফুট। কিন্তু অনিল মায়ার বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে উঠে আসে অনিলের মর্মভেদী আর্তনাদ। অনিল মায়াকে ভালোবাসে, বিয়ে করতে চায় কিন্তু বেকার ছেলেকে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মেয়ে দেবে না তার ওপর অনিল আবার বকাটেও। কথা প্রসঙ্গে মায়ারও বিয়ে না হওয়ার কারণ তাঁদের কথোপকথনের মধ্য থেকেই জানতে পারি। মায়া এবং অনিলের মুখ নিঃসৃত সংলাপ দুটি সমাজের নির্লজ্জ বাস্তব রূপের বহিঃপ্রকাশ। যা অত্যন্ত নির্মম সত্যের প্রকাশ-

“মায়াঃ গরীবের ঘরে কালো হয়ে জন্মান যে কত বড় অভিশাপ তা তুমি বুঝবে না।

অনিলঃ আর গরীবের ঘরে বেকার হয়ে দিন কাটান যে কতখানি মর্মান্তিক তা তুমিও বুঝবে না।

মায়াঃ তুমি জান না অনিলদা, কতবার কতলোক আমাকে দেখতে এসেছে। সেজেগুজে গিয়ে বসেছি। হাজার প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই এক জবাব দিয়ে গেছে – মেয়ে বড়ো কালো, পছন্দ হল না। নয়তো চাইল দশ হাজার টাকা। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় বিষ খেয়ে মরি।

অনিলঃ তা তোমাকে যাতে বিষ খেয়ে না মরতে হয়, তাঁর জন্য তোমায় আমি বিয়ে করতে চাইলাম কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তোমার বাবা রাজী হলেন না। আমি বেকার, আর একটা কারণ তিনি বলেননি, আমি বকাটে বলে।

....

অনিলঃ ভাবেন বই কি! শুধু তোমার বাবা নয়। অনেকেই ভাবে। কিন্তু কেন আমি বেকার..... সে

কথা তো কেউ ভাবে না। দরজায় দরজায় তিন বছর ঘুরেও চাকরি না পেয়ে চাকরির আশা ছেড়ে দিয়েছি মনের দুঃখে। মনের কষ্ট হাসি তামাশা দিয়ে ঢেকে রাখি। লোকে তাই ভাবে আমি বকে গেছি- বেকার বকাটে ছেলে আমি।

মায়াঃ একি অনিলদা, তোমার চোখে জল! ” (মৈত্র শ্রী কিরণ, পৃষ্ঠা- ৩১)

যথার্থই অনিল তাঁর মনের কষ্ট পরিবারের কাউকেই টের পেতে দেয় নি। বুকের মধ্যে বিশাল ওজনের কষ্টের পাহাড়। নিজের মনের কথা মায়ার কাছে প্রকাশ করে ফেললেও অনিল নিজেকে সংযত করে নেয় খুব সুন্দর অ্যাকটিং করেছে বলে।

অমিয়র ভাই নিখিল বয়স ২০-২১ শান্ত সুন্দর চেহারা। বি.এ পরীক্ষা দিয়েছে তার রেজাল্ট বেরনোর অপেক্ষা। অমিয়ের আশা, নিখিল ডিস্টিংশনে পাশ করবে। নিখিল সামান্য রোজগারের জন্য দশ টাকার টিউশনি করতে চাইলে দাদা অমিয় নিষেধ করে কারণ পরীক্ষার সময় দিন নেই রাত নেই পড়াশোনা করেছে তাই এখন একটু বিশ্রাম নিক। কিন্তু নিখিলের মনে সন্দেহ ছিল তার পরীক্ষায় পাশ করার ব্যাপারে। যা অনিলকে নিখিল আগেও জানিয়েছে এবং যদি সে পাশ করতে না পারে তাহলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথাও বলেছে। তবে দাদা অমিয়র মনে অনেক আশা ভাই নিখিলের ভালো রেজাল্টের ব্যাপারে। তাই তো নিখিলের পরীক্ষায় পাশ করবে এই আনন্দে বাড়িতে দ্বারিকবাবুর পরিবার এবং সমরকে নিমন্ত্রণ করে রাখে সকলে একসাথে আনন্দ করবে বলে। অমিয় অফিসের জন্য রওনা দিতে দিতে নিখিলের মনে সাহস দিয়েছে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, পরীক্ষায় ভালো ভাবে উত্তীর্ণ হবেই। মাইনে পেয়েই সে এক চ্যাংড়া খাবার নিয়ে আসবে- সকলে মিলে খুব আনন্দ করা যাবে। এমন সময় দ্বারিকবাবু আরেকবার মঞ্চে অবতীর্ণ হন তাঁর ভাড়ার টাকা নেওয়ার জন্য। কিন্তু অমিয়র মাইনে না হওয়ার কারণে সেই মুহূর্তে দিতে পারে না তবে সে কথা দিয়ে দেয় যে, মাইনে পেয়েই সে তা দিয়ে দেবে আর বিকেলে যেন

মায়াকে নিয়ে অবশ্যই আসেন। সমরকেও বিকেলে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। দুপুর তিনটে বেজে গেলে অমিয় বাড়ি ফিরে দেখে নিখিল তখনও ফেরেনি। অমিয় বাড়ি ফিরে খাবারের ঠোঙা সন্ধ্যার হাতে দিয়ে অনিলকে একটা সুখবর দেয়। অমিয়র অফিসে একটা নতুন পোস্টে গ্র্যাজুয়েট নেবে। নিখিলের জন্য এই পোস্টের কথা তাঁর অফিসের সাহেবকে জানিয়েছে। খবরটা শুনে অনিল একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লো। কারণ নিখিলের চাকরির কথা দাদা অমিয় ভাবলেও অনিলের জন্য সামান্য বেয়ারার চাকরি জুটিয়ে দেওয়ার কথা দাদা ভাবে নি। অনিলের জন্য যদিও একটা ষ্টেশনারী দোকান করার কথা ভেবে রেখেছে অমিয়। এদিকে ক্রমে বাড়িতে নিমন্ত্রিত সকলে এসে উপস্থিত হয়। সমরও এসে উপস্থিত হয়। অমিয় সমরের হাত ধরে সন্ধ্যার সাথে সমরের বিয়ের কথা বলতে যাবে এমন সময় নিখিলের প্রবেশ। যথারীতি নিখিল পরীক্ষায় পাশ না করার খবর নিয়ে বাড়ি ঢুকলে, নিখিলের ফেল করার খবরও সকলে জেনে যায়। এই খবর অমিয়র মাথায় বাজ ভেঙে পড়ার মতো। অত্যন্ত রাগে কষ্টে নিখিলকে কটু কথা বলে ফেলে অমিয়। অমিয় বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলে। তৎক্ষণাৎ নিরুপায় নিখিল নিরুদ্দেশের উদ্দেশে বেড়িয়ে পড়ে। নিখিল সত্যই জামা কাপড় ভরা সুটকেস নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় কাউকে না জানিয়ে।

নাটকে সুনীল চরিত্রটি বড়োই অসহায়। সুনীলের বাবা বিদেশে চাকরি করতেন। সুনীলের জন্মের কিছুদিন পরেই সুনীল পিতৃ-মাতৃহীন হয় অর্থাৎ অমিয়র কাকা-কাকিমা সুনীলের জন্মের কিছুদিন পরেই মারা যান, তাই অনাথ সুনীলকে নিজের কাছে নিয়ে এসে রাজেশ্বর নিজের ছেলের মতোই বড়ো করে তোলেন। সুনীল ছেলেবেলায় ভীষণ মেধাবী ছাত্রও ছিল। ফি বছর ক্লাসে প্রথম হতো। থার্ড ক্লাসে পড়বার সময় ওর টাইফয়েড হয়। প্রাণে বেঁচে গেলেও চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। বেঁচে মরে থাকে সে। রোজগার করার ক্ষমতাও হারায় সে। এই অভাবের সংসারে কিছু উপার্জন করারও উপায় নেই তাঁর তাই এই পরিবারের গলগ্রহ হয়েই

তাঁকে সারা জীবন থাকতে হয়। সেই থেকে গোটা পৃথিবী ওর কাছে অন্ধকার।

নাটকে সমর এমন একজন চরিত্র যে মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। যাকে আপাতদৃষ্টিতে মানসিক বিকারগ্রস্ত বলে মনে হয় সেই রাজেশ্বর বাবু সমরের আসল রূপ চিনতে ভুল করেননি। সমরের বারবার অমিয়ের বাড়িতে আসা সন্ধ্যার জন্য, সেটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। অনিল বুঝতে পারে সমর এবং সন্ধ্যার একে অপরের প্রতি ভালো লাগার বিষয়টি। তবে একদিনের পরিচয়ে সন্ধ্যার প্রতি সমরের দুর্বলতা সন্দেহজনকও বটে, শুধু তাই নয়, সুযোগ বুঝে সন্ধ্যার গায়ে হাত দেওয়া কোন ভদ্র মানুষের লক্ষণ নয়। যার প্রমাণ আমরা নাটকের শেষে বুঝতে পারি। সন্ধ্যার প্রতি সমরের ভালোলাগা যে নিছক প্রতারণা তা সামান্য স্বার্থাঘাতেই বোঝা যায়। কারণ নিখিলের ফেল করার খবর বাড়ির সকলে জানবার পর অমিয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে ঠিক তখনই পরেশ অলোকের দুর্ঘটনার খবর নিয়ে আসে। হাসপাতালে যাওয়ার জন্য দ্বারিকবাবুর তৎক্ষণাৎ টাকার প্রয়োজন, তিনি অমিয়র দিকে চাইলে, অমিয় দ্বারিকবাবুকে তাঁর পাওনা টাকা ফেরত দিতে গিয়ে দেখে তাঁর সমস্ত টাকা চুরি গেছে। বিপদে পড়া অসহায় দ্বারিকবাবু কিন্তু অমিয়কে কটু কথা না শুনিয়ে টাকার জোগাড় ঠিক হয়ে যাবে এই বলে বেড়িয়ে পড়েন। এমন সময় অমিয়র স্ত্রী রাধা ব্যাথায় ছটফট করতে শুরু করে। রাধাকে আর বাঁচানো সম্ভব নয় জেনেও ডাক্তার ডেকে শেষ চেষ্টা করে অমিয় কারণ মানুষের জীবনে "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ"। এমন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অনিল হঠাৎ দশ হাজার টাকা তুলে দেয় তাঁর দাদার হাতে। অনিল জানায় বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে এনেছে টাকা। কিন্তু এই ঘটনা যে অসত্য তা প্রমানিত হয় নাটকের শেষে। অনিল চুরি করার অপরাধে নিজেই পুলিশের কাছে ধরা দেয়। কিন্তু অনিল পুলিশের সাথে যাওয়ার আগে সমরের কাছে তাঁর বোন সন্ধ্যাকে বিয়ে করার অনুরোধ জানায়। তখন জানা যায় সমর বিবাহিত। অনিল এবং সন্ধ্যা

সমরের এই রূপ দেখে স্তম্ভিত। অসহায় অনিল স্ব-ইচ্ছায় জেলে যায় কারণ জেলে অন্তত দুমুঠো খেতে পাবে রোজ। এই ঘটনার প্রতিফলন স্বরূপ বৌদির পরলোক গমন। একটা পরিবারের বিপদের সময়ে পাশে না থাকার মধ্য দিয়েই সমরের বিশ্বাসঘাতকতার ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনিল চোর বলে দোষী সাব্যস্ত হলে, রাজেশ্বর বাবুও মানসিক বিকার গ্রস্ত হওয়ার অতীত সম্পর্কে সন্ধ্যাকে জানায়-

" রাজেশ্বরঃ সংসারের দেনা মেটাবার জন্য আমিও চুরি করেছিলেম। আমি চোর.... তা চোরের ছেলে চোর হবে না তো কি?" (মৈত্র শ্রী কিরণ, পৃষ্ঠা- ৭৬)

এক এক করে নিখিল চলে গেল, অনিল চলে গেল, অমিয়ের স্ত্রী চলে গেল। থেকে গেল সুনীল, মানিক, সন্ধ্যা আর রাজেশ্বর বাবু নিজে। কিন্তু সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অমিয় আশার আলো দেখতে পায়। মানিককে ঘিরে এই অন্ধকারে আলোর রোশনি যেন দেখতে পায় অমিয়।

নাটকে রাজেশ্বর বাবুর আবির্ভাব অনেকটা পাঠকের বা দর্শকের মনের দরজায় হঠাৎ কড়া নাড়ার মতো। তাই মাঝে মাঝেই তাঁকে সাবধান বাণী বলতে শোনা যায়। তবে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে ধাক্কা খাওয়া মানুষটির মুখ নিঃসৃত যে সংলাপগুলি নাট্যকার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা অত্যন্ত বাস্তব এবং তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির এক মর্মন্তুদ সত্য ঘটনার বহিঃপ্রকাশ।

এই করুণ রসাত্মক ঘটনার ঘনঘটা নাটকটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এই জনপ্রিয়তার আরও একটি কারণ লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী- "মধ্যবিত্ত জীবনের ট্র্যাজেডির ওপর লেখা এই নাটক। সেই ট্র্যাজেডি সমাজ জীবনে শিকড় যত নীচে নামিয়েছে ততই এই নাটকের চাহিদা বেড়েছে।

নাটকের ভূমিকা অংশে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের সমালোচনাও এই প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করলাম-

“এই নাটকে জীবন দর্শনের পরিচয় রয়েছে, চরিত্রগুলির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে, কোনটিই কল্পিত নয়। আজকার বাঙ্গালীর সমাজে ওই ধরনের তরুণ তরুণী বৃদ্ধ দেখা যায়। সবগুলি চরিত্রই প্রচণ্ড একটা আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে, বিকৃত ও বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়, কিন্তু কেউ রাষ্ট্র-সমাজ সম্বন্ধে বুলি আওড়াচ্ছে না, শ্লোগান দিচ্ছে না। অথচ নাটকের ভিতর দিকে প্রকাশ পাচ্ছে মূল গল্পটি কোথায়। এইটিই হচ্ছে প্রচারণা বিহীন নাটকের লক্ষণ। নাটকটি মনকে অবসন্ন করে না। দুঃখের এলোমেলো আঘাতে এ নাটকের নায়ক ভগবানের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনে না, মানুষের বিরুদ্ধেও না। দুঃখ দৈন্যে সে স্তব্ধ আড়ষ্ট হয়ে আত্মবিনাশের কথা ভাবে না, ভাবে বংশধরদের কথা, সৃষ্টিধরদের কথা, বিশ্বাস রাখে চিরঞ্জীব হবার সম্ভাবনার ও সঙ্কল্পের কথা। নাটকের তাও একটা বড়ো গুণ, সে গুণ এই নাটকের রয়েছে” (মৈত্র শ্রী কিরণ, পৃষ্ঠা- ৪)।

এই ঘটনা মানুষের জীবন যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত। তাই নাটকের শেষে একটা পরিবারের মর্মান্তিক পরিণতির সাক্ষী থাকলাম আমরা। রাজেশ্বর বাবু যথার্থই বলেছেন “কেউ বাঁচবে না”। তাঁর মুখ নিঃসৃত আরও একটি সত্য কথন নির্গত হয়েছে – “সারা বাংলার মানুষের কান্না? শুনতে পাস না? কি তুই! মানুষগুলো মরছে আর কাঁদছে। কাঁদছে আর মরছে”। সত্যি নাটকের সমাপ্তি পাঠক এবং দর্শক উভয়কেই ভাবিয়ে তোলে, বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয় প্রতিটি মানুষকে। আজ একবিংশ শতকে দাঁড়িয়েও বেকার সমস্যা মিটল না, মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়েদের বিবাহ শেষ কথা হলেও এখন মেয়েরা তবু স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টায় রত কিন্তু নিত্য নতুন সমস্যা ধীরে ধীরে সমাজের ভীত নড়িয়ে দিচ্ছে। এই নাটক আমাদের সমাজের অনেক সমস্যার সামনে এসে দাঁড় করিয়ে দেয়। নাটকে যে কটি চরিত্র আছে তারা প্রত্যেকেই অভাবের তাড়নায় ব্যথিত। একদিকে

যেমন রাজেশ্বরবাবুর পরিবার দরিদ্রতায় আক্রান্ত ঠিক তেমনি দ্বারিকবাবুর পরিবার। এই পরিবার দুটির ছেলেরা ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছে কিছু রোজগারের। দ্বারিকবাবুর ছেলে অলক ভাবছে ব্যবসা করবে কিন্তু পুঁজি নেই, তাই সন্ধ্যার প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা সে ব্যক্ত করতে পারলো না শুধুমাত্র নিজের খুঁটির জোর নেই বলে। সমরের সাথে সন্ধ্যার নৈকট্য মেনে নিতে না পেরে অসময়ে অলোকের অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেল। জগৎবাবুর সাথে অলোকের কথোপকথনে কত আশা ছড়িয়ে ছিল কিন্তু একটা দুর্ঘটনা সব আশাকে ধূলিসাৎ করে দিল। এইভাবেই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির ওপর গভীর সংকট নেমে আসে কিন্তু তবু আমরা মানুষ আশাবাদী। লেখকও আশাবাদী। সব খারাপের শেষ যেমন আছে তেমন সব ভালোরও একদিন শুরু নিশ্চিত রূপেই হবে, যার দায়িত্ব আমাদের সমাজের প্রতিটি মানুষের ওপর বর্তায়।

গ্রন্থঋণঃ

মৈত্র শ্রী কিরণ, বারো ঘণ্টা, রাইটার্স কর্ণার, কলকাতা- ১২।

তথ্যসূত্রঃ

ঘোষ অজিত কুমার, নাটক ও নাট্যকার, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০০।

চৌধুরী দর্শন, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ১৯৯৫।

চৌধুরী দর্শন, গণনাট্য আন্দোলন, ওরিয়েন্টাল বাইন্ডার্স, ১৯৯৪।

মৈত্র শ্রী কিরণ, বারো ঘণ্টা, রাইটার্স কর্ণার, কলকাতা- ১২, পৃষ্ঠা -৬।

মৈত্র শ্রী কিরণ, বারো ঘণ্টা, রাইটার্স কর্ণার, কলকাতা- ১২, পৃষ্ঠা -৮।

মৈত্র শ্রী কিরণ, বারো ঘণ্টা, রাইটার্স কর্ণার, কলকাতা- ১২, পৃষ্ঠা -১৯।

মৈত্র শ্রী কিরণ, বারো ঘণ্টা, রাইটার্স কর্ণার, কলকাতা- ১২, পৃষ্ঠা -৩১।

মৈত্র শ্রী কিরণ, বারো ঘণ্টা, রাইটার্স কর্ণার, কলকাতা- ১২, পৃষ্ঠা -৭৬।

মৈত্র শ্রী কিরণ, বারো ঘণ্টা, রাইটার্স কর্ণার, কলকাতা- ১২, পৃষ্ঠা -০৪।